শালগ্রাম, কষ্টিপাথর ও ভাসমান রামশিলা

প্রবীর আচার্য

প্রথম পর্ব শালগ্রাম শিলা

এটা হল ব্যাসকূট, যার আপাত অর্থ হল, খণ্ড খণ্ড গরুর মাংস মাটিতে পড়ে আছে। কিন্তু কাক শৃগাল সেগুলো গ্রহণ করছে না, পণ্ডিতমণ্ডলী তা কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত অর্থে গামে অংশ মানে পাহাড়ের অংশ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। কাক শেয়াল সেগুলো নিয়ে কী করবে? বরং পণ্ডিতগণ সেগুলিকে কুড়িয়ে নিচ্ছে। কিন্তু পণ্ডিতরাই বা কেন পাথরের টুকরো কুড়োচ্ছে? আসলে এর পিছনে একটা গল্প আছে।

স্বয়ং বিষ্ণু একবার শনির দশায় পড়েছিলেন। আমরা জানি শনির দশা মানে খুব কষ্টের সময়। সেই কষ্টকর সময় থেকে অব্যাহতি পেতে বিষ্ণুদেব ত্রিকূট পর্বতে বজ্রকীট রূপে আশ্রয় নিলেন। সেখানে ওই বজ্রকীট পাহাড়ের কষ্টিপাথর কেটে কেটে গোলে গোলে করে ফেলতে লাগলেন। সেই গোল পাথরগুলো গণ্ডকী নদীতে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আসতে লাগল। সেই গোলে গোলে পাথর গুলিই হল শালগ্রাম শিলা। শালগ্রাম শিলাতে কাক শেয়ালের কী কাজ, বরং পণ্ডিতগণ সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। এই হল দ্ব্যর্থবোধক ব্যাসকূটের মজা।

কষ্টিপাথর, শালগ্রাম এবং রামশিলা তিনিটিই ধর্মীয়ভাবে অত্যন্ত পবিত্র জিনিস। কিন্তু এ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ধোঁয়াশায় ঢাকা। সাধারণত কালো গোল পাথর দেখলেই তাকে শালগ্রাম শিলা এবং কালো রঙের পাথরে খোদিত কোন দেবদেবীর মূর্তি দেখলেই তাকে কষ্টিপাথর বলে অভিহিত করা হয়। আর জলে পাথর ভাসে এ কথাটা তো মানুষ বিশ্বাসই করে না।

আধুনিক পণ্ডিতরা অবশ্য অন্য কথা বলেন। শালগ্রাম শিলা আসলে শাঁখ জাতীয় কম্বোজ

শ্রেণির প্রাণীর জীবাশ্ম। প্রায় ছয় কোটি বছর আগে হিমালয় পর্বতমালা যখন টেথিস সাগর ছিল, তখন সেখানে এই কম্বোজ শ্রেণির প্রাণীরা বসবাস করতো। কথাটার পক্ষে প্রমাণও আছে। শালগ্রাম শিলায় একটা ফুটো থাকে, যেখান দিয়ে এই প্রাণীটি মুখ বের করতো। আর শালগ্রামের ভিতরে থাকে শাঁখের মতো খাঁজকাটা প্যাঁচালো ফাঁপা অংশ, সেখানেই ওই প্রাণীর নরম দেহাংশ নিরাপদে বিরাজ করতো।

কম্বোজ জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী শাঁখের দেহ অত্যন্ত শক্ত খোলা দিয়ে তৈরি। জীবন্ত শাঁখ ধরে এনে তাকে মেরে খোলাটা কাজে লাগানো হয়। তাতেও শাঁখের খোলাটা সাঙ্ঘাতাকি শক্ত। কিন্তু শালগ্রাম শিলা ছয় কোটি বছর ধরে প্রস্তরীভূত কম্বোজ জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম। তাই এর কাঠিন্য সাংঘাতিক। শালগ্রাম শিলা কিন্তু মোটেও কষ্টি পাথর নয় বরং জীবাশ্ম। নেপালের গণ্ডকী নদীতে প্রচুর পরিমাণে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ এর ১.৬.১. সংখ্যক সূক্ত এবং ব্রহ্মসূত্রের ১.২.১৪. সংখ্যক সূক্তে শালগ্রাম শিলাকে বিষ্ণুর প্রতীক রূপে পূজা করার কথা বলা হয়েছে। আদি শঙ্করাচার্য শালগ্রাম শিলাকে শ্রীবিষ্ণু রূপে পূজা করার ব্যাপক প্রচার চালিয়ে ছিলেন। শালগ্রাম শিলার গায়ে অনেক সময় নানা রকমের দাগ দেখা যায়। ভক্তিমার্গের মানুষরা এই দাগগুলোকে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চিহ্ন বলে কল্পনা করে নেন। গোল দাগ থাকলে তাকে উপবীত বলেন। এই চারটি আয়ুধের নানারকম বিন্যাস অনুযায়ী শালগ্রাম শিলার চব্বিশ রকম নামকরণ করা হয়। সবগুলিই অবশ্য বিষ্ণুর নাম। মানুষের ধারণা শালগ্রাম শিলার উপর চন্দনচর্চিত তুলসী পাতা দিলে শ্রীবিষ্ণু খুব সন্তুষ্ট হন। এই শালগ্রাম শিলাকে পূজা করার এবং তুলসী দান করার কঠোর নিয়ম কানুন আছে।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে সবচেয়ে বড় এবং ভারী শালগ্রাম শিলা রাখা আছে। এটি স্বয়ং বিষ্ণুর প্রতিভূ রূপে পূজিত হয়। ভারতবর্ষের সব মন্দিরেই শালগ্রাম শিলা শ্রীবিষ্ণুর প্রতিভূ হিসেবে পূজিত হয়। স্কটল্যাণ্ডে ইসকনের মন্দির 'করুণাভবনে' প্রচুর শালগ্রাম শিলার সম্ভার রাখা আছে। তাছাড়া গ্রামে গঞ্জের ছোটখাটো মন্দিরে বা ব্যক্তিগত মন্দিরেও শালগ্রাম শিলা পূজিত হয়। বর্ধমান জেলার দধিয়া বৈরাগ্য তলায় গোপাল দাস বাবাজি সেবিত রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে প্রচুর শালগ্রাম শিলা রাখা আছে।

একটা ব্যাপারে ভারতীয় প্রাচীন ঋষিদের প্রশংসা করতেই হয়। তাঁরা হিন্দুদের প্রধান দেবতা বিষ্ণুর প্রতীক হিসেবে এমন একটা জিনিস নির্বাচন করেছেন যা অত্যন্ত দুর্লভ। এই শালগ্রাম শিলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং ছয় কোটি বছরের পুরানো জীবাশ্ম। কৃত্রিম উপায়ে কোনওভাবেই একে তৈরি করা সম্ভব নয়। সংঘাতিক কঠিন জীবাশ্ম পাথর যাকে সহজে ভাঙা যাবে না। এমনকি তার উপর খোদাই করে কোনও কারুকার্যও করা যাবে না। তাই বলতে হয় শালগ্রাম শিলার কোন বিকল্প হয় না। এটি একটি মহার্ঘ বস্তু। কিন্তু আবার বলছি শালগ্রাম শিলা কষ্টি পাথর নয় জীবাশ্ম।

শাস্ত্র অনুযায়ী ব্রাহ্মণ ছাড়া শারহলগ্রাম শিলা স্পর্শ করা বা পূজো করার অধিকার কারও নেই। তবে নিমাই পণ্ডিত বৈষ্ণবদেরকে শালগ্রাম শিলার সেবাপূজা করার অধিকার দিয়ে গেছেন। আর আমি এক মস্ত রাখাল হিসেবে শালগ্রাম শিলা নিয়ে জোরপূর্বক কিছু অনধিকার চর্চা করলাম। তার জন্য মাফ চাইছি। তবে শুধুমাত্র রাখালের হাতে পড়লেই যে শালগ্রাম শিলার হেনস্তা হয় তা

কিন্তু নয়। ভক্তি মার্গের লোকেরা হাতেও শালগ্রাম শিলার অনেক সময় নতিজ্জ হয়। তার একটা উদাহরণ দিয়ে এই পর্বে শেষ করছি।

এক বৈষ্ণবের চোখের অসুখ, তাই কবিরাজমশাই তাকে গুগুলির ঝোল খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবদের তো প্রাণী হত্যা করা নিষেধ। তাই বাবাজি বুদ্ধি খাটিয়ে ঘর থেকে শালগ্রাম শিলাটা নিয়ে আসলো। একটা পাথরের উপর গুগলি রাখছে আর শালগ্রাম শিলা দিয়ে ঠুকছে। মুখে বলছে, 'হাম নেহি মারা, খুদ ভগবান নে মারা।' আবার একটা গুগুলি পাথরের উপর রাখছে আর শালগ্রাম শিলা দিয়ে ঠুকছে। আবার মুখে বলছে, 'হাম নেহি মারা, খুদ ভগবান নে মারা।' ব্যাস। এটুকুই।

দ্বিতীয় পর্ব কষ্টিপাথর

এবার আসি কষ্টিপাথরের কথায়। কষ্টি শব্দটি নিকষ শব্দ থেকে জাত। নিকষ শব্দের অর্থ ঘন, যেমন নিকষ কালো, নিকষ অন্ধকার। শব্দার্থ থেকেই বোঝা যায় এই পাথর সাংঘাতিক ঘনত্ব বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রচণ্ড শক্ত।

উৎপত্তিগত ভাবে কষ্টিপাথর আগ্নেয় শিলা। আগ্নেয় শিলার অনেক ভাগ আছে। কষ্টিপাথর ব্যাসাল্ট জাতীয় অতি ঘনত্ব যুক্ত আগ্নেয় শিলা। ভূগর্ভে অতিরিক্ত চাপে আগ্নেয়শিলা গলিত অবস্থায় থাকে। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এই গলিত লাভা ভূপৃষ্ঠে উঠে এসে দ্রুত শীতল হয়ে ব্যাসাল্ট শিলায় পরিণত হয়। যার জন্য অগ্ন্যুৎপাতে লাভাজাত শিলায় কোন স্তর বিন্যাস বা ভাঁজ থাকে না। তবে সব লাভাজাত আগ্নেয় শিলাই কষ্টি পাথর নয়। আগ্নেয় শিলার অনেক ভাগ আছে তার মধ্যে গ্রানাইট জাতীয় কালো পাথরও আগ্নেয় শিলা। এই গ্রানাইট প্রচণ্ড ঘনত্ব যুক্ত এবং শক্তপোক্ত। সাধারণত কালো পাথরের বেশিরভাগ মুর্তি এই শিলায় তৈরি হয়। এবং মানুষ এগুলোকে কষ্টিপাথরের মূর্তি বলে অভিহিত করেন।

কষ্টিপাথরও লাভাজাতীয় আগ্নেয় শিলা। ভূগর্ভের অত্যন্ত গভীরে প্রচণ্ড চাপে অতি ঘনত্ব যুক্ত যে তরল লাভা থাকে, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূপৃষ্টে উঠে এসে তা হঠাৎ শীতল হয়ে শিলীভূত হয়ে যায় এবং তৈরি হয় কষ্টিপাথর। প্রকৃতপক্ষে কষ্টিপাথর গ্রানাইট বা ব্যাসাল্ট জাতীয় পাথর অপেক্ষা ভিন্ন কোন পাথর নয়। বেশি ঘনত্ব যুক্ত উন্নত মানের আগ্নেয় শিলাকেই কষ্টিপাথর বলা হয়। কালো ছাড়াও এর অন্য রং হতে পারে। তবে কালো কষ্টিপাথর সবচেয়ে দামি। ওজন হিসেবে কষ্টি পাথরের দাম প্রায় সোনার দামের সমান। বড় বড় সোনার দোকানে সামান্য একটুকরো কষ্টিপাথর রাখা থাকে সোনা যাচাই করার জন্য। কষ্টি পাথর সহজে চিনতে হলে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রয়োগ করতে হবে। নাইট্রিক অ্যাসিডে এই পাথর দ্রবীভূত হয় না।

সব ধরনের আগ্নেয় শিলায় সাধারণত ক্ষারীয় ফেল্ডসপার, সিলিকোট, কোয়ার্জ, অভ্র, লৌহলবণ, অ্যালুমিনা, ম্যাগনেশাইট, টাইটেনিয়াম ইত্যাদির জটিল লবণ কেলাসিত আকারে থাকে। উপাদানের অনুপাতের ভেদে পাথরের রকমও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই কেলাস বা স্ফটিকের দানা যত সুক্ষ্ম এবং ঘন সন্নিবিষ্ট হয় পাথর তত দামি ও শক্ত হয়।

সাধারণত স্বর্ণকাররা সোনার বিশুদ্ধতা যাচাই করার জন্য যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন সেটি বেশ মজার। আমরা জানি সোনা বিশুদ্ধ নাইট্রিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় না। উপরন্তু কষ্টিপাথরও

নাইট্রিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় না। সোনার গয়না না গলিয়ে তার বিশুদ্ধতা যাচাই করতে হলে কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করা হয়। কষ্টি পাথরের উপর সোনার গয়নাটি ঘষে দুটি দাগ কাটা হয়। সোনার চেয়ে কষ্টিপাথরের কাঠিন্য বেশি। তাই ঘষলে সোনা ক্ষয় হয়ে কষ্টি পাথরের উপর দাগ তৈরি হয়। একটি দাগের উপর নাটট্রিক অ্যাসিড দেওয়া হয়। তাতে পাথরও ক্ষয় হয় না, সোনাও ক্ষয় হয় না। কিন্তু সোনাতে থাকা ভেজাল যথা তামা রুপো এসব গলে যায়। ফলে সোনার দাগটি কিছুটা অস্পষ্ট হয়। অ্যাসিড প্রয়োগ না করা দাগের সাথে এই দাগের তুলনা করে ভেজাল তথা খাদের পরিমাণ আন্দাজ করা যায়। তবে এটা একটা ভোঁতা পদ্ধতি, এভাবে ভেজালের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। সোনায় খাদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে তাকে গলিয়ে ফেলাই উচিত।

মূর্তি তৈরির উপাদান হিসেবে আগেকার দিনে ভাস্কররা কষ্টিপাথর নির্বাচন করতেন। তবে যেহেতু এই পাথর প্রচণ্ড শক্ত, ছেনি বাটালিতে কাটা খুবই কষ্টকর, তাই ভাস্কররা মূর্তি তৈরির জন্য ছোট আকারের কষ্টিপাথর নির্বাচন করতেন। এই কারণেই কষ্টিপাথরের মূর্তিতে খুব বেশি অলংকরণ থাকে না, সাদামাটা হয়। তাছাড়া দামের দিক থেকেও কষ্টিপাথর অত্যন্ত দুর্মূল্য। সে কারণেই বেশিরভাগ কষ্টি পাথরের মূর্তি যেগুলি পাওয়া যায় তাদের উচ্চতা বড়জোর দু ফুট। রাজা জমিদার বা ধনী ব্যক্তি ছাড়া কষ্টিপাথরের মূর্তি তৈরি কেউ করাতে পারতেন না। কষ্টি পাথরের ঘনত্ব বেশি হওয়ায় মূর্তি ভারীও হয় যথেষ্ট। ঘনত্বের জন্যই মূর্তির গা অত্যন্ত মসৃণ ভাবে পালিশ করা যায়। যার জন্য কষ্টি পাথরের মূর্তি গুলির ঔজ্জ্বল্য বা গাত্র লাবণ্য হয় প্রচণ্ড।

তবে প্রত্নতাত্ত্বিকরা মূর্তির পাথরের উপাদানের গুণ বিচার না করে তার ঐতিহাসিক মূল্যকে বেশি গুরুত্ব দেন। অর্থাৎ উপাদান যাই হোক না কেন, যে মূর্তি যত বেশি প্রাচীন তার ঐতিহাসিক মূল্য তত বেশি। মোদ্দা কথা মূর্তি কষ্টি পাথরের তৈরি হলেও প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে আলাদা কোনও গুরুত্ব পায় না।

আমাদের এলাকায় পাটুলির রাজাদের তৈরি ছ'টি কষ্টি পাথরের মূর্তি আছে। সেগুলি সুরক্ষিত আছে শেওড়াফুলির গঙ্গাতীরে নিস্তারিণী মন্দিরের লকারে। মূর্তিগুলির উচ্চতা পনেরো ইঞ্চি থেকে আঠারো ইঞ্চির মধ্যে। মূর্তিগুলি অসাধারণ শিল্প শৈলীতে নির্মিত। মূর্তিগুলি হল মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিভুজ বিশ্বেশ্বর, অষ্টভূজা বিশ্বেশ্বরী, অষ্টাদশভূজা মহিষমর্দিনী, অষ্টভূজা মহিষমর্দিনী এবং অষ্টভূজা বারাহি। এর মধ্যে দুটি মূর্তির ছবি এখানে দেয়া হল। বাকিগুলি অন্যত্র আলোচিত হবে।

সবশেষে বলা যেতে পারে আমাদের ভারতবর্ষের গ্রামে গঞ্জে ভাঙাচোরা কিংবা গোটা পাথরের মূর্তি প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। অন্তর্জাল থেকে দেখলাম বাংলাদেশের মাহিসন্তোষ নামক গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রচুর কষ্টিপাথর। সে গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করেন এই পাথর কুড়িয়ে নিয়ে গেলে তাদের বিপদ হয়। তাদের সদ্যজাগ্রত নজর এড়িয়ে বহিরাগত কোন মানুষও সে পাথর নিয়ে যেতে পারেন না।

যে কোনও গ্রামের ষষ্ঠীতলা, ঠাকুরতলা অথবা গাছতলা খুঁজলেই প্রাচীন মূর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যাবে। সেগুলো হিন্দু-বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের হতে পারে। তবে কালো পাথরের মূর্তি

মানেই কষ্টিপাথরের মূর্তি নয়। বেশিরভাগই কালো গ্রানাইট কিংবা ব্যাসাল্ট পাথরের তৈরি। প্রাচীনতার দিক থেকে কিন্তু সেগুলোর যথেষ্ট মূল্য আছে। আমাদের উচিত সমস্ত মূর্তি ভাঙ্গা কিংবা গোটা যাই হোক না কেন সচেতনভাবে এবং স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করা। কারণ মূর্তিপাচারকারী চক্রগুলি সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি সচেতন।

তৃতীয় পর্ব ভাসমান রামশিলা

শ্রীলঙ্কায় রাবণের অশোক কাননে বন্দিনী সীতা। বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র ভারতের একদম দক্ষিণ উপকূলে ভারত মহাসাগরের তীরে দণ্ডায়মান। সামনে অকূল পাথার। কীভাবে এই বিশাল সৈন্যবাহিনী সমুদ্র পার হয়ে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছাবে? সর্বাধিনায়ক শ্রীরামচন্দ্রের কপালে চিন্তার কুঞ্চনরেখা। এমন সময় এগিয়ে এলেন সৈন্যবাহিনীর দুজন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সর্বাধিনায়ককে অভিবাদন জানালেন কমান্ডার ইঞ্জিনিয়ার দ্বয়। তাঁদের নাম হল নল এবং নীল। তাঁরা সর্বাধিনায়ক শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন, 'ইয়োর এক্সেলেন্সি, অনুমতি পেলে আমরা এখান থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত একটা বিশাল সেতু নির্মাণ করে দেব। তার উপর দিয়ে পার হয়ে যাবে আপনার সৈন্যবাহিনী।'

কাজ শুরু হয়ে গেল পূর্ণোদ্যমে। বানর সৈন্যগণ রাজ্যের পাথর বয়ে বয়ে আনতে শুরু করল। নল আর নীল দুজন কমান্ডার ইঞ্জিনিয়ার সেই পাথরগুলো জয় শ্রীরাম বলে ছুঁয়ে দিতে লাগলেন। আশ্চর্য কথা তাঁদের স্পর্শ পেয়ে পাথর জলে ভাসতে লাগলো। সর্বাধিনায়ক দেখলেন আমার নাম করে পাথর ছুঁলে জলে ভাসছে। তাহলে আমি নিজে পাথর জলে ফেললেই তো ভাসবে। শ্রীরামচন্দ্র একটা পাথর নিজেই জলে ফেললেন। আশ্চর্য কথা সেটা টুপ করে ডুবে গেল জলে। দর্প চূর্ণ হয়ে গেল সর্বাধিনায়কের।

যাইহোক মাত্র পাঁচ দিনে তৈরি হয়ে গেল সমুদ্রের উপর ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে শ্রীলঙ্কার উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত আটচল্লিশ কিলোমিটার লম্বা পৃথিবীর দীর্ঘতম সেতু। যে সেতুকে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা নাম দিয়েছেন 'অ্যাডাম'স ব্রিজ'। প্রাচ্যের মানুষ নাম দিয়েছেন 'সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্'।

হতে পারে এটা কল্পকাহিনী। কিন্তু ৫০০০ বছর আগে এত বড় দুঃসাহসিক বিশাল প্রোজেক্টের কথা যে পণ্ডিতের মাথায় আবির্ভূত হয়েছিল, তিনি হলেন স্বয়ং আদি কবি বাল্মীকি। আজকের দিনেও এত বড় প্ল্যান-পরিকল্পনার কথা বিজ্ঞানীরা চিন্তা করতে ভয় পান। ভাবতে অবাক লাগে তখনকার দিনে এই কল্পনাটা কত উচ্চস্তরের। প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। তবে আদি কবি বাল্মীকি পাথর জলে ভাসার অলীক কল্পনাটা কোথা থেকে পেলেন? না, এটা অলীক কল্পনা নয়। দুর্লভ হলেও ভাসমান পাথর কিন্তু বাস্তবে পাওয়া যায়।

একটা বাতাসা কে জলে ফেলে দিলে প্রথমে বাতাসাটা জলে ভাসতে থাকে। কিছুক্ষণ পর বাতাসার উপরের স্তর গলে গিয়ে ফুটো হয়ে যায়। তখন তার ভেতরে জল ঢুকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসাটা জলে ডুবে যায়। এটা আমরা সবাই জানি।

আসলে মোদক মশাই যখন বাতাসা তৈরি করেন, তখন ফেনাযুক্ত ফুটন্ত চিনির রস টপটপ করে পাটার উপর ফেলতে থাকেন। সেই ফেনা ঠাণ্ডা হয়ে জমে বাতাসা হয়ে যায়। বাতাসার

উপরটা মসৃণ কিন্তু ভেতরটা ফোঁপরা।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভূগর্ভের গ্যাস এবং গলিত লাভা অনেক সময় ফেনার মতো আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই ফেনা যখন মাটিতে পড়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়, তখন উপরটা বাতাসার মতো মসৃণ এবং ভিতরটা ফোঁপরা হয়ে যায়। তরলের পৃষ্ঠটানের জন্য এমনটা হয়। উপরটা দেখলে মনে হয় নিরেট। এই ফোঁপরা পাথর হয় হালকা, তাকে জলে ফেললে ভাসতে থাকে। প্রকৃতিতে এই ধরনের পাথর খুব কম হলেও পাওয়া যায়। এগুলোই হল ভাসমান শিলা। ভক্তিমার্গের লোকেরা একেই বলেন রামশিলা।

সমুদ্রের জল লবণাক্ত হওয়ায় সাধারণ জল অপেক্ষা ঘন হয়। ওই ঘন জলে রামশিলা অবলীলায় ভাসতে থাকে। তবে সাধারণ জলেও রামশিলা ভাসে। আদিকবি নিশ্চয় ব্যাপারটা জানতেন। তাই এমন একটা জম্পেশ কাহিনির অবতারণা করতে পেরেছেন।

বর্তমানে নাসার বিজ্ঞানীরা উপগ্রহ থেকে পর্যবেক্ষণ করে অনুমান করছেন 'অ্যাডাম'স ব্রিজ মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম সেতু হতেও পারে। সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়ায় সেতুটির বেশিরভাগ অংশ জলের তলায় নিমগ্ন হয়ে গেছে। এ নিয়ে গবেষণা চলছে, ফলাফলের জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতেই হবে। সেক্ষেত্রে রামায়ণের কাহিনির প্রেক্ষাপটে সত্যতা থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।❑